যুগান্তর

সংকটের মুখে উচ্চশিক্ষা

প্রকাশ : ০৬ জুলাই ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

মো. মইনুল ইসলাম

সম্প্রতি লন্ডনের টাইমস হায়ার এডুকেশনের এক জরিপ নিয়ে দেশে বেশকিছু আলোচনা-সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছে। জরিপে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দেশগুলোর ৪১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মান অনুসারে সাজানো হয়েছে।

তাতে স্থান পেয়েছে চীনের ৭২টি, ভারতের ৪৯টি এবং তাইওয়ানের মতো ক্ষুদ্র দ্বীপের ৩২টি। জঙ্গিবাদ অপবাদে বিদ্ধ এবং গণশিক্ষা হারে অবমূল্যায়িত পাকিস্তানের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ শ্রীলংকার কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ও সে তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। শুধু স্থান পায়নি বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় উন্নয়ন, মান-সম্মানের স্বার্থেই যে কোনো দেশপ্রেমিক চিন্তাশীল ও বিদ্বজ্জন এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারে না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই একটি দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সমাবেশ এবং তাদের চর্চার ফলে সৃষ্ট মানুষই উন্নতমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো দেশে বহন এবং বিতরণ করে। এককথায় এগুলোই মূলত একটি দেশে সভ্যতার বাতিঘর এবং উন্নত মানবসম্পদ সৃষ্টির কারখানা।

বাংলাদেশ এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্রুততম উন্নয়নশীল দেশ বলে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক ঘোষণা দিয়েছে। সেই উন্নয়ন বজায় রাখা এবং এগিয়ে নেয়া উন্নত মানবসম্পদ ছাড়া যে সম্ভবপর নয়, তা আমাদের নীতিনির্ধারকদের অবশ্যই জানা আছে।

তবে উপর্যুক্ত প্রতিবেদনের নিরিখে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উচ্চজ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্র বলা সঠিক হবে বলে মনে হয় না, যদিও দেশে ৪৫টি সরকারি এবং ৫৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

আমার মতে, বেসরকারির মধ্যে মাত্র দুটিতে পড়াশোনার মান ভালো। বাকিগুলো অনেকটা সার্টিফিকেট বিপণনের প্রতিষ্ঠান। তাই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেন্দ্র করেই লেখাটি আবর্তিত হচ্ছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একসময় গর্ব করে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো। ১৯৯৫-এর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়টিরই দুয়েকজন শিক্ষককে কৌতুক করে বলতে শুনতাম ''এর 'ফোর্ড' গেছে; শুধু 'অক্স'টি আছে''। এখন কি তাহলে বলতে হবে এর 'অক্স'টিও গেছে!

বিশ্বের সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বিশ্বের সর্বোচ্চ ও সর্বাধুনিক জ্ঞান আহরণ, বিতরণ এবং উদ্ভাবন হবে, এটাই আমাদের কাম্য।

উদ্ভাবন বলতে বোঝায় নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, যার জন্য দরকার গবেষণা। উন্নত বিশ্বে গবেষণা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কল্পনা করা যায় না। শিক্ষাদানের সঙ্গে সমান তালে চলবে গবেষণা, যার মাধ্যমে বিদ্যমান জ্ঞানকে প্রশ্ন করা হবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে এবং এর ফলে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হবে। এভাবেই উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে চলেছে।

একটি মানসম্মত পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত থাকলেই সেখানে একটি Intellectually vibrant environment বা জ্ঞানচর্চায় স্পন্দিত একটি পরিবেশ অনুভূত হয়। ক্লাস শেষ এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম শেষ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি এবং অনেক শিক্ষকের কক্ষে বাতি থাকে অনির্বাণ। রাত ৯-১০টার পর বাতি নিভে।

কারণ- অধ্যয়ন বা গবেষণাসংক্রান্ত কাজকর্ম চলছে। সেসবই একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। বলা হয়, আমাদের দেশে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান, গবেষণাগার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা নেই। সেটা কিছুটা সত্য। তবে পুরো সত্য নয়। শিক্ষকরা গবেষণার ব্যাপারে আগ্রহী হলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধে গবেষণা এবং উন্নত পাঠদান আদর্শায়িত হলে এসব সুবিধা ক্রমেই সৃষ্টি হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকের মধ্যেই এ ব্যাপারে তেমন কোনো আগ্রহ লক্ষ করা যায় না। কিছুসংখ্যক শিক্ষক আছেন যারা নিয়মিত ক্লাসই নেন না। কয়জন শিক্ষক নিয়মিত লাইব্রেরিতে যান এবং লাইব্রেরির কার্ড আছে সেটাও গবেষণার বিষয়। লাইব্রেরিতে রক্ষিত বইগুলোর এডিশন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহু পুরনো।

সর্বশেষ বা সাম্প্রতিক এডিশনের বইয়ের সংখ্যা নামমাত্র। কারণ শিক্ষকদের একটি ভালো অংশ ওই পুরনো বইগুলোর ফটোকপি দিয়ে বছরের পর বছর পড়াচ্ছেন। নিজ বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালগুলো বের হচ্ছে, সেগুলো কি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে রাখা হয় এবং রাখা হলে এগুলো কি শিক্ষকরা ব্যবহার করেন?

হ্যাঁ, ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উচ্চশিক্ষা প্রসারের নামে নতুন এক উদ্ভাবন ঘটেছে। সেগুলো হল সান্ধ্যকালীন কোর্স। সেটা উচ্চশিক্ষার স্বার্থে নাকি কোচিং-বাণিজ্য, তা কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে হবে।

তাতে দিনের বেলার শিক্ষাদান যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে শিক্ষার্থীদের হাতে একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি সার্টিফিকেট ধরিয়ে দেয়ার এই মহড়া উচ্চশিক্ষার সার্বিক মানের জন্য মোটেই সহায়ক নয় বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

প্রত্যেক সংগঠনের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ও একটি সংগঠন এবং তার একটি সম্প্রদায় আছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় A Community of scholars বা পণ্ডিতদের একটি সম্প্রদায়।

ছাত্র বা শিক্ষার্থীরা হচ্ছে কনিষ্ঠ বা নবীন পণ্ডিত এবং শিক্ষকরা হচ্ছেন জ্যেষ্ঠ পণ্ডিত। এ সম্প্রদায়ের সম্মিলিত উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান অন্বেষণ এবং জ্ঞানচর্চা। এক সময়ে (ব্রিটিশ, এমনকি পাকিস্তান আমলে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধারাটি কিছুটা প্রবহমান ছিল। বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে এ ধারাটি ক্ষীয়মাণ হয়ে আসে। এখন সেটা মৃত প্রায়। তবে সম্প্রতি কয়েকজন শিক্ষককে ইমেরিটাস অধ্যাপক সম্মানী প্রদান করে বিশ্ববিদ্যালয় কিছুটা ঋণমুক্ত হয়েছেন এবং গুণীর গুণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এরকম আরও কয়েকজন শিক্ষককে এ সম্মান প্রদান করা যেত। তবে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতো বরেণ্য পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদকে কেন জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান দেয়া হল না, সেটা আমাদের মতো মানুষকে বিস্মিত করে।

উচ্চশিক্ষার অবনতির বেশ কয়েকটি কারণ আছে। এর একটি হচ্ছে- বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়ের মাঝে অতিরিক্ত দলচর্চা আর দলচর্চাতেই লাভ বেশি। বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে সাদা দলের ভাগ্য খুলে যায়। তাদের গ্রুপের নেতাদের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ হওয়ার স্বর্ণদ্বার খুলে যায়। কেবল ঢাকায় নয়, অন্যান্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয়েও এসব পদে তারা নিয়োগ পান।

তাছাড়া মঞ্জুরি কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন, সরকারি ব্যাংক, বীমা ও স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান বা পরিচালক হওয়া যায়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে নীল দলের নেতাদের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সংস্কৃতিতে এগুলোই মূল্যবান পদ ও কাজ। অধ্যাপনা ও গবেষণা তেমন কোনো মূল্যবান কাজ নয়। এর না আছে আর্থিক মূল্য, না আছে সামাজিক মূল্য।

যে দেশে বছর গুনে এবং জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রফেসর বা অধ্যাপক করা হয়, সেদেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার যে বেহাল দশা হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। profess করা বা publish করা দরকার কী! বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত নোট বই কিংবা জার্নালে লেখা থাকলেই যথেষ্ট।

আরেকটি বিষয় হল পিএইচডি ডিগ্রি। এটি অবশ্যই একটি বড় মাপের ডিগ্রি। এখন দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেকটা আলু-পটলের দরে এ ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে।

প্রতিবেশী ভারতের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও এ কাজটি করছে বলে মনে হয়। ব্রিটেনসহ পশ্চিমা বিশ্বের স্বীকৃত মানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এগুলো এমফিল ডিগ্রি পেত কিনা সন্দেহ। এগুলোর বেশকিছু লেখা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাটিং ও পেস্টিং, জবারবি ড়ভ literature অত্যন্ত দুর্বল। ২-৪টি মনে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আনা এবং অতিশয় নিুমানের থিসিস।

সামান্য কিছু অদল-বদল করে চালিয়ে দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাদের অন্তত দু'জনকে দেখেছি ইংরেজিতে প্রশ্ন করতে পারে না, দরখাস্ত লিখতে পারে না এবং পারে না Research proposal লিখতে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ছাড়াও এখন কলেজ এবং সরকারি বিভাগের অনেক কর্মকর্তাও নামের আগে ডক্টর লেখেন। শুনলাম নীলক্ষেত থেকে বানিয়ে নেয়া অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বাইরের কিছু দেশ থেকে পিএইচডি সার্টিফিকেট কেনা যায় অনলাইনে।

তারপর আরেক নতুন হিড়িক শুরু হল 'প্রফেসর ডক্টর' লেখার। এ প্রবণতাটি বিশেষ করে লক্ষ করা গেল ইয়াজউদ্দিন সাহেব রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর। অথচ বিলাতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি বেশকিছু প্রফেসর যাদের পিএইচডি ডিগ্রি নেই।

কারণ, তাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক বইপুস্তক এবং আন্তর্জাতিক মানের জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো এতই মৌলিক এবং পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত যে, তাদের একটি আনুষ্ঠানিক পিএইচডি ডিগ্রির দরকার পড়ে না।

এমনই একজন ছিলেন আমার পিএইচডি থিসিসের সুপারভাইজার ড. এলেনের স্ত্রী শীলা এলেন। তিনি (শীলা) ব্রাড ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের প্রফেসর ছিলেন। তার কোনো পিএইচডি ছিল না।

ছিল বেশকিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক ও প্রবন্ধ। তবে আমাদের দেশে দুয়েকটি ভালো পিএইচডি থিসিস হয় না, তা নয়। অবশ্যই হয়, তবে সংখ্যায় নগণ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শিক্ষক নিয়োগেও মেধার চেয়ে দলীয় আনুগত্য বা বিভাগ-অনুষদীয় দলাদলি অনেকাংশে প্রাধান্য পায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রয়াত ভদ্রলোক এবং পণ্ডিত অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছিলেন, 'আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষক নিয়োগের চেয়ে ভোটার নিয়োগে বেশি গুরুত্ব নেই।'

এটা বহুলাংশে সত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি বেশি নির্বাচন এবং দলবাজির ফলে প্রভাষক বা লেকাচারার নিয়োগে দলীয় আনুগত্য তথা কোন দলের সমর্থক বা ভোটার হবে, সে বিবেচনাটিও কম প্রাধান্য পায় না।

দলীয় সমর্থনে নিয়োগ পাওয়া দলবাজ দুর্বল শিক্ষক নিয়োগও শিক্ষার মানের অবনতির একটি কারণ। দুয়েকটি নিয়োগে সদস্য থেকে এসব দুঃখজনক ঘটনা দেখতে হয়েছে। একটি নিয়োগে যৌক্তিক কারণে আমার আপত্তি ছিল। নিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান উপ-উপাচার্য কোনো একটি বিশেষ জেলার লোক। অন্যদিকে প্রার্থীর পিতাও ওই জেলারই লোক এবং একজন নেতা।

উপ-উপাচার্য বিএনপিপন্থী সাদা দলের লোক। ফালু এমপি হলে তিনি তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন। অন্যদিকে প্রভাষক প্রার্থীর বাবা আওয়ামী লীগ সমর্থক নীল দলের নেতা। কিন্তু পরিচিত মহলে তিনি একজন তদবিরবাজ, তোষামোদকারী, সুবিধাবাদী এবং প্রয়োজন মতো সহিংস ব্যক্তি বলেও খ্যাত। প্রার্থীদের প্রায় সবাই আমার ছাত্র ছিল। তাদের মেধা এবং স্বভাব-চরিত্র ভালোভাবেই জানা ছিল।

মেধা এবং স্বভাব চরিত্রে দুটি মেয়ে ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের এবং সত্যিকার অর্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার জন্য যথোপযুক্ত। কিন্তু ছেলে প্রার্থীটি তাদের সাক্ষাৎকার পর্বে উপস্থিত থাকতে বারণ করে এবং এই বলে ভয় দেখায় যে, পথে তাদের অপহরণ এবং গুম করা হবে। যেমন- কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা বিভাগে প্রভাষক নিয়োগের সময় সবচেয়ে মেধাবী প্রার্থী কামালুদ্দিন আহমেদকে সাক্ষাৎকারের প্রাক্কালে একদল ভাড়াটে দুর্বৃত্তছাত্র অপহরণ করে।

বিষয়টি গণমাধ্যমে এসেছিল এবং দুর্বৃত্তরা কোন ছাত্রসংগঠনের তা-ও দেশবাসী জানে। যাহোক আমার এখনকার আলোচ্য প্রভাষক নিয়োগে ওই দুটি মেয়ে প্রার্থী ঝুঁকি নিয়ে আসেনি।

ফলে ছেলে প্রার্থীটি শূন্য মাঠে গোল দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার আপত্তির মুখে সে যাত্রা নিয়োগ স্থগিত হয়। এটাও বলতে হয় ছাত্রের পিতা তার ছেলের ব্যাপারে আমার কাছে বেজায় অনুনয়-বিনয় করেছিল। কিন্তু আমার উত্তর ছিল, যোগ্য প্রার্থী সুবিচার পাবে। কারও প্রতি অবিচার করা হবে না।

এর কিছুদিন পর আমি অবসরে যাই। তখন ছেলে প্রার্থীর রাজনীতিক পিতা এবং জেলাপ্রেমী উপ-উপাচার্য মিলে নিয়োগটি করিয়ে নেয়। তারপর বিভাগের দুয়েকজন চেয়ারম্যান শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে নবীন এই শিক্ষকের ক্লাস ফাঁকির বহু অভিযোগ শুনেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম ফাঁকিবাজ শিক্ষকের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলটির যে দৈন্যদশা, বিশেষ করে শিক্ষা ও শিক্ষকের মানের, তা এই উপ-উপাচার্যের স্বজনপ্রতির কারণেই, তা ওয়াকেবহাল মহল জানে। তারই একটি বহিঃপ্রকাশ দেখলাম মাসখানেক আগে। এ বিষয়ে ফেসবুকে লেখা একজন সহৃদয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের অভিযোগ থেকে।

আগেই বলেছি, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পদটি বেজায় অবমূল্যায়িত হয়ে পড়েছে। এর বিপরীতে আকর্ষণীয় হয়ে পড়েছে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের পদ। কারণ হচ্ছে শিক্ষাদান, পাণ্ডিত্য এবং গবেষণার অবমূল্যায়ন এবং ক্ষমতা ও আর্থিক সুবিধা লাভের সুযোগ। অথচ উপর্যুক্ত পদগুলোতে কোনো জ্ঞানচর্চা হয় না, হয় প্রশাসনিক ক্ষমতাচর্চা। সারা বিশ্বে জ্ঞানই শক্তি বলে স্বীকৃত।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাস্তবে জ্ঞানশক্তি বলে স্বীকৃত নয়। উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পণ্ডিত শিক্ষকরা এসব প্রশাসনিক কাজ পছন্দ করে না বরং দূরে থাকে। তারা জ্ঞান সাধনাকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয় এবং ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। তাই এসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের মূলমন্ত্র হচ্ছে publish বা perish, অর্থাৎ প্রকাশ করো অথবা মৃত্যুবরণ করো।

মনে পড়ে, বিলাতে আমার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ব্রুনেলের অধ্যাপক জন ভেইজির কথা। Economics of Education-এর খ্যাতনামা অধ্যাপক ভেইজিকে দ্বিতীয়বার উপাচার্যের পদে আমন্ত্রণ জানালে তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, 'গত ৩-৪ বছরে তেমন কোনো পড়াশোনা বা প্রকাশনার সুযোগই পাইনি। আরেক দফা উপাচার্যের কাজ আমার বুদ্ধিবৃত্তিক মৃত্যু ঘটাবে।'

ওই বরণ্য অর্থনীতিবিদ যথেষ্ট গবেষণার তহবিল এবং সুযোগের প্রতিশ্রুতি পেয়ে অস্ট্রেলিয়ার একটি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক বিবেকবান এবং পণ্ডিত অধ্যাপক এ পদগুলোর প্রতি তাদের অনীহা প্রকাশ্যেই আমাদের বলেছেন। তবে এখনও জ্ঞানের আলো ঢাকাসহ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিভে যায়নি।

কিছুসংখ্যক তরুণ শিক্ষক এখনও তাদের লেখায়, প্রকাশনায়, সেমিনারে এবং পণ্ডিতসভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং আলোচনায় জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন। তাতে আমরা আশান্বিত হই এবং উৎসাহ বোধ করি।

শিক্ষা একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, যার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক বা ডিগ্রিজাতীয় স্তর আছে। বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষার দুর্বলতার একটি বড় কারণ হচ্ছে ছাত্রদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে দুর্বল শিক্ষা। ইংরেজি, অঙ্ক ও বাংলায় অপ্রতুল এবং দুর্বল শিক্ষকের কারণে শিক্ষার্থীরা শেখে কম।

এ দুর্বলতা নিয়ে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে। শিক্ষার সর্বস্তরে এ অধোগামিতা যে জাতীয় বিপর্যয়ের রূপ ধারণ করেছে, তা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন দেশপ্রেমিক বিদ্বজ্জনের লেখা থেকে স্পষ্ট।

জাতীয় নীতিনির্ধারকরা বিষয়টিকে আশা করি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন। কারণ মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি এবং প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। শিক্ষিত-জ্ঞানী মানুষই উন্নয়নের যে মূল নায়ক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মো. মইনুল ইসলাম : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।